

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতি ও সমকামিতা

রহস্যময় আমাদের এই প্রকৃতি আর প্রকৃতির অংশ সুবিশাল জীবজগৎ, আর আরো রহস্যময় বোধ হয় আমাদের চারপাশের মানুষগুলো। অন্য প্রাণীদের মতই দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথ পাড়ি দিতে গিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে মানুষকে অবিরতভাবে যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি মানুষ প্রকৃতিজগতের অন্যান্য প্রাণীদের মতই বিবর্তিত হয়েছে আরো একটি জৈবিক তাড়নায়, সেটি হল যৌনতা। সত্যি বলতে কি বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তির কথা ভাবলে দুটো জিনিস আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই উঠে আসে - প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার এবং টিকে থাকা। তাই, যৌনতা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির এক বিশেষ শক্তি। শুধু প্রকৃতি কেন, আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে যৌনতা। যৌনতাকে আশ্রয় করে সারা দুনিয়ার কবি- সাহিত্যিকেরা সাহিত্য রচনা করেছেন প্রতিটি যুগেই। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, যৌনতার কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ- বিগ্রহ এবং রক্তপাতও কম হয়নি। তার উল্লেখ পাওয়া যায় সাহিত্যে, ইতিহাসে, আর শিল্পীর ভাস্কর্যে। পশ্চিমা বিশ্বে হোমারের সেই প্রাচীন সাহিত্য *ইলিয়াড* শুরুই হয়েছিলো একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, আর সেই যুদ্ধ আবার হয়েছিলো একটি নারীকে অপহরণের কারণে - সেই হেলেন; হেলেন অব ট্রয়। আমাদের সংস্কৃতিতেও প্রাচীন রামায়নের কাহিনী আমরা জানি - রাম- রাবণের যুদ্ধ হয়েছিলো সীতাকে অপহরণের জন্য। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্যে অজস্র মিথুনরত মূর্তির আধিক্য প্রাচীন ভারতে যৌনতার প্রতীকী শক্তিকে স্পষ্ট করে তুলে। আপনি যদি কখনো ভারতের পুরী গিয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে দেখবেন - পুরীর মন্দিরের খুব উঁচুতে - কোনার্ক, ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো প্রভৃতি মন্দিরের সর্বত্রই আছে যৌনক্রিয়ারত নর- নারী আর পশুর মূর্তি। আবার সেই সব মূর্তির পাশে লতা পাতা ফল ফুল ত্রিভুজ দিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য যৌনতার প্রতীক। ইন্দোনেশিয়ার সেলিবিস দ্বীপের পুরনো মন্দিরের চারপাশে পাওয়া যায় স্তন, স্ত্রী- অংগ এবং নগ্ন পুরুষদেহের পুরুষাঙ্গের অসংখ্য মূর্তি। শুধু প্রাচীন মন্দির নয়, যৌনতার প্রতীক অত্যন্ত প্রকট আকারে ধরা আছে বহু আধুনিক মন্দিরেও - গৌরিপট্ট এবং শিবলিঙ্গে।

পুরীর মত ঠিক একইভাবে আপনি যদি প্যারিস রোম কিংবা ভ্যাটিকানসিটি¹ ভ্রমণ করেন, দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য যৌন আবেদনময় আবেগঘন নগ্ন নর নারীর মূর্তি। নগ্নতা আর যৌনতা গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডে, রডিনের চুসনে, ভেনাসে কিংবা পিকাসোর বহু ছবিতে। যৌনতা আছে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে, যৌনতা আছে কালীদাসের মেঘদূতে কিংবা কুমারসম্ভবম- কাব্যে। যৌনতা আছে হাল আমলের হুমায়ুন আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন, শোভা দে কিংবা তসলিমা নাসরিনে। যৌনতা কোথায় নেই? বার্নার্ড শ সত্যই বলেছেন - ‘যৌনতা সব জায়গাতেই কম বেশি পাওয়া যায় - কেবল টেলিফোন ডিরেক্টরি ছাড়া’। সত্যি বলতে কি, যতই আড়াল রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, যৌনতাও আসলে মানুষের প্রধান চাহিদাগুলোরই একটি। শুধু চাহিদা বলে খেমে গেল ভুল হবে - যৌন প্রবৃত্তি হল সৃষ্টিশীলতা, চিন্তন ও মননের এক অন্যভূবন। এখানে নানা স্রোতের খেলা প্রতিনয়িতই চলে। চলে নানা টানাপোড়েন। কিন্তু চাহিদা কিংবা সৃষ্টিশীলতা যেমন আছে, যৌনতার অবদমনও খুব উৎকটভাবেই দৃশ্যমান, অন্ততঃ আমাদের সমাজে। যৌনতার এমনি অবদমিত এবং অচ্ছুৎ এক বাসিন্দার নাম হচ্ছে সমকামিতা।

অনেকেই সমকামিতা নিয়ে বেজায় বিব্রত থাকেন। নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন। কাঠমোল্লারা তো গালি দিয়ে খালাস- সমকামিরা হচ্ছে খচ্চর স্বভাবের, কুৎসিৎ রুচিপূর্ণ, মানসিক বিকারগ্রস্ত। এমনকি প্রগতিশীলদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম ওজর আপত্তি। যারা শিক্ষিত, ‘আধুনিক’ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, গে, লেসবিয়ন ইত্যাকার তথাকথিত ‘পশ্চিমা’ শব্দের সাথে কমবেশি পরিচিত হয়েছেন, তারাও খুব কমই ব্যাপারটিকে মন থেকে ‘স্বাভাবিক’ বলে মেনে নিতে পারেন। তাদের অনেকেই এখনো ব্যাপারটিকে ‘প্রকৃতি বিরুদ্ধ’ মনে করেন, আর নয়ত ভাবেন - পুরো ব্যাপারটি উৎকট ধরনের ব্যাতিক্রমধর্মী কিছু, এ নিয়ে ‘ভদ্র সমাজে’ যত কম আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল। উপরে উপরে না বললেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই মনে করেন সমকামিরা তো হচ্ছে গা ঘিনে ঘিনে বিষ্ঠাকৃমি জাতীয় এঁদো জীব। মরে যাওয়াই মনে হয় এদের জন্য ভাল। সমাজ সভ্যতা রক্ষা পায় তাহলে। কিন্তু সত্যই কি ‘সমকামিতা’ এরকম ঘণ্য কোন কিছু?

¹ ভ্যাটিকান সিটির মূর্তিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানকার বহু মূর্তির যৌনাঙ্গে কৃত্রিম পাতার আস্তরণ (fig leaves) পড়িয়ে রাখা আছে। মূর্তির রঙ এর সাথে পাতার রঙের বৈসাদৃশ্য উৎকটভাবে লক্ষণীয়। কথিত আছে, পোপ পায়াস ৯ মাইকেল এঞ্জেলো সহ অন্যান্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যকার অব্যবহৃত নগ্নতা দেখে অতিশয় ভীত হন, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এই ভয়াবহ নগ্নতার হাত থেকে রক্ষা করতে তার অনুচরদের সাথে নিয়ে হাতুরী শাবল সহযোগে ভ্যাটিকানে অবস্থিত মূর্তিগুলোর লিঙ্গ ধংস করেন। তারপর ওগুলোতে পাতার আস্তরণ লাগিয়ে দেন যাতে শিল্পকর্মগুলোর সৌন্দর্য ‘অটুট’ থাকে। এই ঘটনা ইতিহাসে Great Castration নামে পরিচিত। ঔপন্যাসিক ড্যান ব্রাউন তার ‘এঞ্জেলস এন্ড ডিমনস’ বইয়ে এর উল্লেখ করেছেন।

সমকামিতা কি?

বাংলায় ‘সমকামিতা’ শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ -‘সমকামী’ থেকে। আবার সমকামী শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত ‘সমকামিন’ শব্দটির মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তাকে ‘সমকামিন’ বলা হত। সম এবং কাম শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে ‘সমকামিন’ (সম + কাম + ইন) শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সমকামিতা নামের বাংলা শব্দটির ব্যবহারও খুব একটা প্রাচীন নয়। প্রাচীনকালে সমকামীদের বোঝাতে ‘ঔপরিষ্টক’ শব্দটি ব্যবহৃত হত। যেমন, বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামীকে চিহ্নিত করতে ‘ঔপরিষ্টক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এ শব্দের বহুল ব্যবহার আর লক্ষ্য করা যায় নি, বরং ‘সমকাম’ এবং ‘সমকামী’ শব্দগুলোই কালের পরিক্রমায় বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে। কেউ কেউ আজ সমকামিতাকে আরেকটু ‘শালীন’ রূপ দিতে ‘সমপ্রেম’ শব্দটির প্রচলন ঘটাতে চান²।

সমকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক ‘হোমো’ এবং ল্যাটিন ‘সেক্সাস’ শব্দের সমন্বয়ে। গ্রীক ভাষায় ‘হোমো’ বলতে বোঝায় ‘সমধর্মী’ বা ‘একই ধরনের’। আর সেক্সাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। কাজেই একই ধরনের অর্থাৎ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। ‘হোমোসেক্সুয়াল’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কার্ল মারিয়া কার্টবেরি ১৮৬৯ সালে। তিনি একটি ছোট পুস্তিকায় (Pamphlet) প্রুসিয়ার সমকামীদের প্রতি নিবর্তনমূলক আইনের সমালোচনা করেন। পরবর্তীতে এই শব্দটিকে তাদের বইয়ে ব্যবহার করেন জীববিজ্ঞানী গুস্তভ জেগার এবং রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং ১৮৮০’র দশকে। ইবিং-এর *Psychopathia Sexualis* বইটি সাধারণ মানুষ এবং চিকিৎসকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে অচীরেই এবং সেই সাথে ‘হোমোসেক্সুয়াল’ এবং

² অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

‘হেটারোসেক্সুয়াল’ শব্দদুটিও যৌনপ্রবৃত্তি বোঝাতে ইংরেজী পরিভাষায় স্থান করে নেয়।

আমি এই বইয়ে বৈজ্ঞানিক (মূলত জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) এবং আধুনিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা থেকে আলোচনা করে একটি উপসংহারে পৌঁছতে চেষ্টা করব। বাংলা সহ পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যগুলোতে সমকামিতার উল্লেখ এবং পরিশেষে বিভিন্ন খ্যাতনামা সমকামীদের জীবন নিয়েও খানিকটা গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তবে সেগুলো আসবে ধীরে ধীরে। প্রথম দিকের পর্বগুলো মূলত বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি এই পর্বগুলোতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকেই দেখার চেষ্টা করব সমকামিতা ব্যাপারটি সত্যই ‘অস্বাভাবিক’ বা ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ’ কোন কিছু কিনা। আমার বিশ্লেষণের ভিত্তি হবে এ মুহূর্তে বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের কাছ থেকে পাওয়া সর্বাধুনিক তথ্য।

আমি শুরু করছি ভুল ভাবে ব্যবহৃত কিছু মন্তব্য দিয়ে, যা সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় :

“সমকামিতা প্রাকৃতিক কোনোভাবেই হতে পারে না মূলত (নারী- পুরুষে) কামটাই প্রাকৃতিক”

কিংবা অনেকে এভাবেও বলেন -

“নারী আর পুরুষের কামই একমাত্র প্রাকৃতিক যা পৃথিবীর সকল পশু করে। যার মূল লক্ষ্য হলো বংশ বৃদ্ধি”

আমি ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম এবং ব্লগসাইটগুলোতে স্পর্শকাতর এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এ ধরনের অসংখ্য মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। উক্তিগুলো স্রেফ উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেকেই সমকামিতাকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ’ বা

‘অস্বাভাবিক’ হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য উপরোক্ত ধরণের যুক্তির আশ্রয় নেন। আমি এই উক্তির পেছনের যুক্তিগুলো নিয়েই মূলতঃ এখানে আলোচনা করব।

আসলে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ’, ‘অস্বাভাবিক’, ‘প্রাকৃতিক নয়’ -এই ধরণের শব্দচয়ন করার আগে এবং তা ঢালাওভাবে তা প্রয়োগ করার আগে কিন্তু খোলা মনে পুরো বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল ‘স্বাভাবিক’ (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন) আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল ‘প্রকৃতি বিরুদ্ধ’। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে ³ -

‘যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোন কাজেরই কথা নয়।’

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু- গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের ‘প্রাকৃতিক’। আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙ্গে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোষাক শিল্পে নিয়োজিত করে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজার করে চলেছে - তারা সবাই আসলে ‘প্রকৃতি বিরুদ্ধ’ কুকর্মে নিয়োজিত - কারণ, ‘প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না’। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, নাসার মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপন থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলায় ক্ষেত্রে ‘প্রকৃতি’ খুব সহজ একটি মাধ্যম, অনেকের কাছেই। তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা ‘শিক্ষিত জনেরা’ বড্ড ভালবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামি, উভকামিদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই

³ রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ, ১২৯৬, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। এছাড়া মুক্তমনায় রাখা ‘Tagore without Illusion’ পাতাটিও দেখা যেতে পারে।

তা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্ধুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরনের কুযুক্তি বা হেতুভাসের (logical fallacy)। ইংরেজীতে এই হেতুভাসের পুথিগত নাম হল - 'ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল' বা 'অ্যাপিল টু নেচার'⁴। এমনি কিছু 'অ্যাপিল টু নেচার' হেতুভাসের উদাহরণ দেখা যাক -

১। মিস্টার কলিন্সের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিন্স ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মত গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।

২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং 'কম্পলিটলি ন্যাচারাল'।

৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।

৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেঙ্কুয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ?

এমনি উদাহরণ দেওয়া যায় বহু।

উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষণীয় 'প্রকৃতি' নামক মহাস্বপ্নকে পুঁজি করে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের স্বভাবজাত অ্যাপিল টু নেচার- এর শিকার হচ্ছে সমকামীরা। সমকামীদের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সাংগঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘৃণা। সমকামিতাকে একটা সময় দেখা হয়েছে মনোবিকার, মনোবৈকল্য বা বিকৃতি হিসেবে। সমকামীদের অচ্ছুৎ বানিয়ে এদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তো আছেই, কখনো এদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহত্যার পথে। কখনো বা স্রেফ সমকামী হবার কারণে করা

⁴ হেতুভাস নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য <http://www.infidels.org/library/modern/mathew/logic.html> দ্রষ্টব্য

হয়েছে হত্যা। আর এগুলোতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে ধর্মীয় সংগঠন এবং রক্ষণশীল সমাজ। সমকামীদের প্রতি হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে ইংরেজীতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি শব্দ - হোমোফোবিয়া (Homophobia)। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিতান্ত অন্যায্য। তবে মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের প্রেক্ষাপটে যাবার সমকামিতা বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমাদের সকলের ভাল করে জানা দরকার।

আমরা জেনেছি সমকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। সমকামী মানুষেরা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে বলে তাদের (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। বর্তমানে হোমোসেক্সুয়াল শব্দটি একাডেমিয়ায় কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলেও সাড়া বিশ্ব জুড়ে সমকামীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'গে' এবং 'লেসবিয়ান' শব্দ দুটি অধিক হারে মিডিয়ায় ব্যবহৃত হয়। গে এবং লেসবিয়ান শব্দ দুটিরও ইতিহাস আছে। গালভরা এবং বহুল প্রচলিত 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দের বদলে পশ্চিমে 'গে' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯২০ সালে। তবে সে সময় এটির ব্যবহার একেবারেই সমকামীদের নিজস্ব গোত্রভুক্ত ছিলো। প্রিন্টেড মিডিয়ায় শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে। লিসা বেন নামে এক হলিউড সেক্রেটারী 'Vice Versa: America's Gayest Magazine' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশের সময় সমকামিতার প্রতিশব্দ হিসেবে 'গে' শব্দটি ব্যবহার করেন, যদিও সে সময় 'গে' শব্দটি 'হাসি খুশি' অর্থেই ব্যবহৃত হত। গে শব্দটি যথার্থ অর্থ নিয়ে আসলে ব্যাপকতা পায় ১৯৬০ সালের দিকে যখন সমকামীদের অধিকার রক্ষায় সচেতন লোকজন 'Gay is good' জাতীয় বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতে থাকে। তার পর থেকেই 'গে' শব্দটি 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে দ্রুত ইংরেজী পরিভাষায় স্থান করে নেয়। তবে সমকামিতার সাথে যুক্ত সবাই যে সার্বিকভাবে 'সমকামী'দের বোঝাতে 'গে' শব্দটি ব্যবহার করেন তা অবশ্য নয়। যেহেতু পরিভাষায় 'গে' শব্দটি অনেকক্ষেত্রেই পুরুষবাচক শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়, নারী সমকামীদের অনেকেই তাদের নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে তুলে ধরতে 'লেসবিয়ান' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই শব্দটি এসেছে গ্রীস দেশের 'লেসবো' নামের দ্বীপমালা থেকে। কথিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে স্যাপো নামে সেখানকার এক শিক্ষিকা মেয়েদের মধ্যকার প্রেমময় জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করে 'কবিতা উৎসব' পালন করেছিলেন। প্রথম দিকে লেসবিয়ান বলতে 'লেসবো দ্বীপের অধিবাসী' বোঝালেও, পরবর্তীতে নারীর সমপ্রেমের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তবে এ ব্যাপারে একটি জিনিস পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। যদিও সমকামিতা নির্দেশক শব্দগুলো পরিভাষায় স্থান পেয়েছে খুব বেশী দিনে

আগে নয়, কিন্তু যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতা মানব সভ্যতায় সব সময়ই ছিলো, প্রাচীন কাল থেকেই। বার্ন ফোন তার ‘হোমোফোবিয়া’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন⁵,

‘Though the term is of recent invention, the behavior it describes has always been part of sexual activity. That human beings have desired, loved, and had sex with members of their own sex over time is abundantly demonstrated in visual art and medical, philosophical and literary texts of all historical periods’.

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, কেন তাহলে সমকামিতা নির্দেশক শব্দ আগে পরিভাষায় ছিলো না? এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির মত সমকামিতাও অতি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবেই পৃথিবীর বহু জায়গায় স্বীকৃত ছিল। কেউ আলাদাভাবে সেটাকে ‘শ্রেণীকরণ’ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোন কোন সংস্কৃতিতে সমকামিতা ব্যাপারটির মূল এতোটাই গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো যে, এটি নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করারও কারো অবকাশ ছিলো না⁶। ফরাসী ঐতিহাসিক ফুকোর মতে⁷, ‘সেক্সুয়ালিটি’ ব্যাপারটাই আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কার। আধুনিক সমকামীদের প্রবৃত্তিকে আলাদাভাবে শ্রেণীকরণ করার আগে তাদের আলাদা নামে ডাকার কোন প্রয়াস কারো মধ্যে দেখা যায়নি। সে সময় প্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতা ছিলো, কিন্তু আলাদাভাবে ‘সমকামী’ বলে কিছু ছিলো না। অনেক বিশ্লেষকই মনে করেন, সমকামীদের নিয়ে আলাদা শ্রেণীকরণ না থাকায় তাদের উপর কোন শারীরিক বা মানসিক নিবর্তন বা নিপীড়নও সেভাবে ছিলো না।

সমকামিতা কি কেবল পশ্চিমা বিশ্বের বিকৃতি?

অনেকেই সমকামিতাকে ভুলভাবে কেবল পশ্চিমা বেলান্লাপনা বলে মনে করেন। তাদের অনেকে ভাবেন, সমকামিতা হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের বিকৃতি। এটা ঠিক নয়। সমকামিতার ইতিহাস আসলে অনেক পুরনো। প্রাচীন গ্রীসের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সমকামীতার স্পৃহার কথা জানা যায়। ধর্মীয়ভাবে সমপ্রেম এখানে স্বীকৃত ছিল। ‘ভেনাস’ ছিলেন তাদের

⁵ Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador, November 3, 2001

⁶ Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition.

⁷ Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, Vintage, April 14, 1990

কামনার দেবী। এই দেবীই আবার সমকামীদের উপাস্য ছিলেন। এছাড়া ‘প্রিয়াপ্রাস’ নামেও আরেক দেবীকেও সমকামীরা আরাধনা করত বলে শোনা যায়। তাহিতির বিভিন্ন জায়গায় সমকামে আসক্ত ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতার মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আনাতেলিয়া, গ্রীস এবং রোমার বিভিন্ন মন্দিরে ‘সিবিলি’ এবং ‘ডাইওনীসস’ এর পূজো ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। সিবিলির পুরোহিতেরা গাল্লি নামে পরিচিত ছিলেন। এরা নারীবেশ ধারণ করতেন। মাথায় নারীর মত দীর্ঘ কেশ রাখতে পছন্দ করতেন। এরা সমকামী ছিলেন বলেও অনুমিত হয়। পরে এশিয়া মাইনর থেকে সিবিলি পূজো পারস্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এ সমস্ত প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়।

পারস্য সাহিত্যে অনেক কবি তাদের প্রেমিকাকে পুরুষ নামে ডাকতেন - তবে এটি সম্ভবতঃ অঞ্চল ভিত্তিক কোন প্রথা। আরব সমাজে বয়স্ক পুরুষ এবং বালকের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য তো বটেই মধ্যযুগে (ইসলামের বিস্তৃতির সময়) বহুল প্রচলিতও ছিল। সাকী বলতে এখন আমাদের চোখের সামনে সুরাপাত্র হাতে যে মোহনীয় লাস্যময়ী নারীর ছবি ভেসে উঠে, প্রাচীন আরবে সাকী বলতে তা বোঝানো হত না। গবেষকরা বলেন, সাকী বলতে আরবে নারীর পাশাপাশি সুদর্শন কিশোরও বোঝানো হত। তারা শুধু পানপাত্রে দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করতো না, পাশাপাশি অন্যান্য পার্শ্ব সেবাও পরিবেশন করতো। এর উল্লেখ পাওয়া যায় আরবের বহু সমকামী কবিদের রচনায়^৪। এমনকি কোরানের কিছু আয়াতে (৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) বেহেস্তে উদ্ভিন্নযৌবনা ছরীর পাশাপাশি ‘মুক্তা-সদৃশ’ কিশোর বালকের সেবা পাওয়ার কথা বলা

^৪ প্রসঙ্গত আরবীয় কবি আবু নুয়াসের (৭৫৬ - ৮১৪) একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে -

O the joy of sodomy!
So now be sodomites, you Arabs.
Turn not away from it--
therein is wondrous pleasure.
Take some coy lad with kiss-curls
twisting on his temple
and ride as he stands like some gazelle
standing to her mate.
A lad whom all can see girt with sword
and belt not like your whore who has
to go veiled.
Make for smooth-faced boys and do your
very best to mount them, for women are
the mounts of the devils

হয়েছে।

আসলে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সমকামিতা সবসময়ই মানব সমাজে ছিল। গ্রীক, রোমান, চৈনিক, পাপুয়া নিউ গিনি অথবা উত্তর আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতায় সমকামীতার অজস্র উদাহরণ আছে। সমকামিতা ছিল অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতায়। হিন্দু পুরানেও উল্লেখ পাওয়া যায় পুরুষীনি অথবা তৃতীয় প্রকৃতির। বর্তমানে গুজরাটের সঞ্জলপুরে বহুচোরা মাতার যে মূর্তি আছে তা অনেকটা 'সিবিলির' আদলে রচিত। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশেষ শাখা আছে। এরা একসাথে রাধা-কৃষ্ণ-এর ভজনা করে থাকে। এদের অনেকে স্ত্রীবেশ ধারণ করে। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধক গদাধর গোস্বামী নাম নিয়েছিলেন রাধিকা। আবার গোবিন্দঘোষ রঙ্গদেবী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আসলে মূল কথা হচ্ছে, সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা - এগুলো কোনটাই আধুনিক পশ্চিমাদের আবিষ্কার কিংবা বিকৃতি নয়, বরং এটি প্রাচীন সভ্যতা থেকে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই ছিলো; পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইন্টারনেটের কারণে ব্যাপারগুলো সামনে চলে এসেছে।

এখন কথা হচ্ছে সমকামিতা কি জন্মগত নাকি আচরণগত? এটি বুঝতে হলে আমাদের যৌনপ্রবৃত্তিকে বুঝতে হবে। আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি কোন যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষণ বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায়। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে অনেক সময় সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল যৌনতার ক্ষেত্র কিন্তু খুবই বিস্তৃত। এতে সমকামিতা যেমন আছে তেমনি আছে উভকামিতা, কিংবা দুটোই, এমনকি কখনো রূপান্তরকামিতাও। আমি আমার বক্তব্য মূলতঃ 'সমকামিতা' বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব, যদিও অন্যান্য যৌন-প্রবৃত্তিগুলো (যেমন রূপান্তরকামিতা)ও বিভিন্ন সময় আলোচনায় উঠে আসবে। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, সমকামিতা নিঃসন্দেহে যেমন আচরণগত হতে পারে, তেমনি হতে পারে জন্মগত বা প্রবৃত্তিগত। এতে পরস্পরবিরোধিতা নেই। যাদের

সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি জন্মগত, তাদের যৌন-প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না, তা সে থেরাপি দিয়েই হোক, আর ঔষধ দিয়েই হোক। মানুষের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাস নামে একটি অংগ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সিমন্ লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালামাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমকামিদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়⁹। আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন¹⁰। এছাড়াও আরো বিভিন্ন গবেষণায় মনস্তাত্ত্বিক নানা অবস্থার সাথে পিটুইটরি, থাইরয়েড, প্যারা-থাইরয়েড, থাইমাস, এড্রিনাল সহ বিভিন্ন গ্রন্থির সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়। যদিও ‘গে জিন’ বলে কিছু এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু সহ বেশ কিছু জৈবিক ফ্যাক্টর সমকামী প্রবণতা তৈরী এবং ত্বরান্বিত করতে পারে (আমি এদের গবেষণা নিয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব)। এই ধরনের গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হয় সমকামী মনোবৃত্তি হয়ত অনেকের মাঝেই জন্মগত না জেনেটিক, আরো পরিষ্কার করে বললে, ‘বায়োলজিক্যালি হার্ড-ওয়্যার্ড’। জন্মগত সমকামিরা ‘বায়োলজিক্যালি হার্ড-ওয়্যার্ড’ হলেও আচরণগত সমকামিরা তা নয়। এরা আসলে বিষমকামী। এরা কোন ব্যক্তিকে বিষমলিঙ্গের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সাথে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। যেমন, জেলখানায় দীর্ঘদিন আটকে থাকা বন্দীরা যৌনসঙ্গীর অভাবে সমলিঙ্গের কয়েদীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। কিন্তু, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যায়, এদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের যৌন প্রবৃত্তির বাইরেও আছে উভকামিতা, কিংবা আছে উভকামিতার সমকামিতা। আলফ্রেড কিন্সে এই ধরনের বিভিন্ন যৌনতাকে পরিমাপ করার জন্য ‘যৌনতা বিষয়ক স্কেল’ উদ্ভাবন করেন। এই স্কেলের এক প্রান্তে আছে পরিপূর্ণ বিষমকাম, অন্যপ্রান্তে পরিপূর্ণ সমকাম। দুই মেরুর মাঝামাঝি রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়-প্রধানতঃ বিষমকাম, তবে প্রায়ই সমকাম; সমান সমান বিষমকাম এবং সমকাম; প্রধানত সমকাম তবে প্রায়ই বিষম কাম; প্রধানত সমকাম, তবে মাঝে মধ্যে বিষমকাম ইত্যাদি। কিন্সের এ স্কেল¹¹ নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও এটি অন্ততঃ বোঝা যায় যে, আমাদের যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে খুবই বিস্তৃত, এবং যৌন প্রবৃত্তি একইভাবে সকলের মাঝে ক্রিয়াশীল হয় না।

⁹ Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

¹⁰ যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এই পরীক্ষার ফলাফল কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

¹¹ কিন্সের স্কেল নিয়ে বিস্তৃতভাবে এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমকামিতা প্রবনতা আসলে সমান্তরাল যৌনতারই অংশ

আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা কোন যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষণ বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায়। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়।

যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই সেক্স বা যৌনতার উদ্ভব নিয়ে কিছু না কিছু বলতে হয়। রিচার্ড ডকিন্সের ‘বিবর্তনীয় স্বার্থপর জিন’ (selfish gene) তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে যৌনতার উদ্ভব নিঃসন্দেহে প্রকৃতির একটি মন্দ অভিলাষ¹²। কারণ দেখা গেছে অযৌন জনন (asexual) প্রক্রিয়ায় জিন সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি বংশ বিস্তার করা হয় (প্রকৃতিতে এখনো অনেক এককোষী জীব, কিছু পতঙ্গ, কিছু সরিসৃপ এবং কিছু উদ্ভিদ- যেমন ব্ল্যাক বেরি অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে) তবে বাহকের পুরো জিনটুকু অবিকৃত অবস্থায় ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করা যায়। কিন্তু সে বাহক যদি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তার জিনের অর্ধেকটুকুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে এটি বাহকের জিনকে ভবিষ্যত প্রজন্মে স্থানান্তরিত করবার সম্ভাবনাকে সরাসরি অর্ধেকে নামিয়ে আনে¹³। এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার আসলে কোন অর্থই হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল নির্যাসটিই হল - প্রকৃতি তাদেরই টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকেই বাড়তি সুবিধা দেয় যারা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভাবে নিজ জিনের বেশি সংখ্যক অনুলিপি ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারে¹⁴। সে

¹² Dylan Evans & Howard Selina, *Introducing Evolution*, Icon Books, UK, 2001

¹³ এই বইয়ের পরিশিষ্টে ‘যৌনতার ব্যয়’ নামে একটি গাণিতিক মডেল উপস্থাপনা করে যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের মধ্যকার প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

¹⁴ Joann C. Gutin, *Why Bother? Sex seems like an unnecessary complicated means of reproducing. So how did it ever started? And why did it catch on?* Discover, June, 1992.

হিসাবে কিন্তু অযৌন জননধারীরা (আমি এখন থেকে এদের ‘অযৌনপ্রজ’ হিসেবে উল্লেখ করব) বহু ধাপ এগিয়ে আছে যৌনধারীদের (এদের উল্লেখ করা হবে ‘যৌনপ্রজ’ নামে) থেকে।

রয়, সিলো আর ট্যাংগো - তিনে মিলে ছিলো এক পেঙ্গুইন পরিবার



ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কের চিড়িয়াখানা। সেখানে এক পেঙ্গুইন দম্পতির বাস। একেবারে প্রেমিক দম্পতি যাকে বলে। ছ বছর ধরে তারা একসাথে আছে। তাদের আলাদা করাই মুশকিল। এরা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে রাখে। এক সাথে গলা ছেড়ে ডেকে উঠে। আর শারীরিক যৌনসম্পর্ক

তো আছেই। একটি দিকেই কেবল ব্যতিক্রম- এই পেঙ্গুইন দম্পতির দুজনেই পুরুষ। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে যখন বুঝলেন তখন তো তাদের আক্কেল গুরুম। কার ভুলে প্রথম থেকেই এই পুরুষ পেঙ্গুইন দুটোকে এক সাথে রাখা হয়েছিল কে জানে। তবে এই ‘অস্বাভাবিক’ সম্পর্ক তো আর বেশী দিন চলতে দেয়া যায় না। কাজেই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, তাদের খাঁচায় কিছু নারী পেঙ্গুইন ছেড়ে দেয়া হবে। তারা ভাবলেন, নারী সংগ পেয়ে নিশ্চয় তারা এই ‘বেলাপ্লাপনা’ ত্যাগ করবে। কিন্তু রয় আর সিলো খাচার নতুন মেয়েদের দিকে ভালমত তাকিয়ে দেখলোই না, সম্পর্ক তৈরি করা তো দূর কি বাত! তারা নিজেদের প্রেমে নিজেরাই মশগুল। কর্তৃপক্ষই আর কি বা করবেন।

এর মধ্য আরেক ঘটনা ঘটলো। রয় সিলো দম্পতি¹⁵ তাদের বাসার পাশে পড়ে থাকা একটি বড় পাথরের টুকরো তাদের বাসায় নিয়ে এসে নিয়ম করে তা দিতে শুরু করলো। এটা দেখে বোধ হয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মনে একটু দয়া হলো। তারা আরেক ‘হেটারোসেজুয়াল’ পেঙ্গুইন দম্পতির কাছ থেকে একটি ডিম ধার করে নিয়ে এসে রয় আর সিলোর বাসায় রেখে দিলো। সেই ডিমে মাস খানেক ধরে নিয়ম করে তা দিয়ে রয় আর সিলো বাচ্চা ফুটালো। জন্ম হল এক ফুটফুটে মেয়ে পেঙ্গুইন শিশুর - ট্যাংগো। তারা সেই বাচ্চাকে নিজেদের বাচ্চা হিসেবেই আদর যত্ন করে বড় করে তুললো। বড় হয়ে ট্যাংগো নিজেও সমকামী পেঙ্গুইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ‘তানুজি’ নামে আরেক নারী পেঙ্গুইনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

রয়- সিলো- ট্যাংগোর এই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নিয়ে ২০০৫ সালে আমেরিকায় প্রথম বাচ্চাদের জন্য একটি বই প্রকাশিত হয় And Tango Makes Three নামে¹⁶। আমেরিকায় শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে সমকামিতাকে গঠনমূলকভাবে উপস্থাপনার প্রথম দৃষ্টান্ত এটি। কিন্তু আমেরিকার রক্ষণশীল মহল এতে খুশি হননি। তারা বইটিকে ‘শিশুদের জন্য ক্ষতিকর’ হিসেবে আখ্যায়িত করে স্কুলের লাইব্রেরীগুলোতে এই

¹⁵ ছয় বছর এক সাথে থাকার পরে এই সমকামী দম্পতি আলাদা হয়ে গেছে বলে সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশিত হয়েছে।

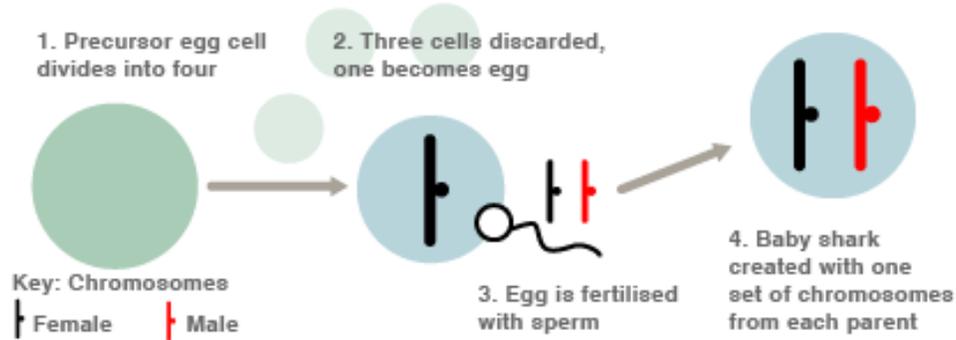
¹⁶ And Tango Makes Three, Peter Parnell and Justin Richardson, Simon & Schuster Children's Publishing, April 26, 2005

বইয়ের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করতে চান। কিন্তু আমেরিকার আদালতের রায়ে সেটা আর সম্ভব হয়নি।

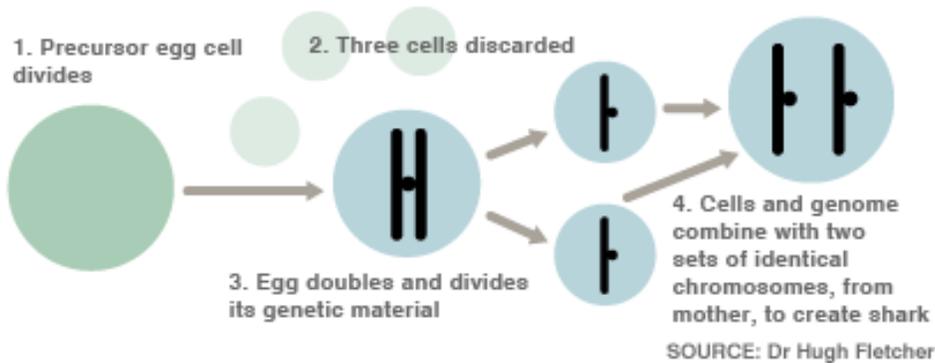
কারণ অযৌনপ্রজন্মের যৌনপ্রজন্মের মত সময় নষ্ট করে সঙ্গী খুঁজে জোড় বাঁধতে হয় না। সংগম করে করে শক্তি বিনষ্ট করতে হয় না। নিজের বা সঙ্গীর বক্ষ্যাত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। বুড়ো বয়সে ভায়াগ্রা সেবন করতে হয় না। কিংবা সন্তানের আশায় হুজুর সাজিদাবাদীর কাছে ধর্গা দিতে হয় না। যথাসময়ে এমনিতেই তাদের বাচ্চা পয়দা হয়ে যায়। কিভাবে? আমরা এখন যে ক্লোনিং -এর কথা জেনেছি, এদের প্রক্রিয়াটা অনেকটা সেরকম। এক ধরনের 'প্রাকৃতিক ক্লোনিং' এর মাধ্যমে এদের দেহের অভ্যন্তরে নিষেক ঘটে চলে অবিরত। ফলে কোন রকম শুক্রানুর সংযোগ ছাড়াই দেহের ডিপ্লয়েড ডিম্বানুর নিষেক ঘটে চলে। জীববিজ্ঞানে এর একটি গালভরা নাম আছে - পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)।

HOW NORMAL FERTILISATION AND PARTHENOGENESIS DIFFER

Normal Fertilisation



'Virgin birth' - Parthenogenesis



চিত্রঃ সাধারণ নিষেক প্রক্রিয়া এবং পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ার পার্থক্য দেখানো হয়েছে

কাজেই পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজরা সত্যিকার অর্থেই অপারাজেয়, অন্ততঃ যৌনপ্রজদের তুলনায়। এদের কোন পুরুষ সঙ্গীর দরকার নেই। সবাই এক এক জন মাতা মরিয়ম - সয়ন্তু যীশু উৎপাদনে পারঙ্গম। যৌনপ্রজরা যে সময়টা ব্যয় করে সঙ্গী খুঁজে তোষামোদ, আদর সোহাগের পশরা খুলে ধুকতে ধুকতে জিন সঞ্চালন করে, সে সময়ের মধ্যে অযৌনপ্রজরা গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করে ফেলতে পারে - এবং বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই। ফলে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' এরা বাড়তে থাকে গুনোগুন হারে। নীচে এরকম একটি অযৌনপ্রজ প্রজাতি "হুইপটেল গিরগিটি"র ছবি দেওয়া হল।



চিত্রঃ হুইপটেল গিরগিটি - অযৌনপ্রজ প্রজাতির হাট্‌থ্র। এদের বংশবিস্তারের জন্য কোন পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।

মজার ব্যাপার হল এই হুইপটেল গিরগিটিকুলের সবাই মহিলা, আর তা হবে নাই বা কেন! তাদের ত কোন পুরুষ শয্যাসংগীর দরকার নেই। পুরুষেরা তাদের জন্য 'বাহুল্যমাত্র'। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে সেক্স- সদৃশ একধরনের ব্যাপার ঘটে। দেখা গেছে এক গিরগিটি আরেক গিরগিটিকে যদি জড়িয়ে ধরে রাখে তাহলে তাদের ডিম পাড়ার হার বেড়ে যায়¹⁷। প্রকৃতির সমকামী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত¹⁸! আমাদের কাছে যত অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধই মনে হোক না কেন, হুইপটেল গিরগিটি বা এ

¹⁷ David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

¹⁸ বিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন তার 'ইভলুশন রেইনবো' (২০০৪) বইয়ে হুইপটেল গিরগিটিদের 'লেসবিয়ান লিজার্ড' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ধরনের সরিসৃপদের কাছে কিন্তু এটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা, এবং এরা এভাবেই প্রকৃতিতে টিকে আছে, এবং টিকে আছে খুব ভালভাবেই। ২০০৬ সালে সরিসৃপকুলের আরেক প্রজাতি কমোডো ড্রাগন (Komodo Dragon) কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা পয়দা করে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দেয়¹⁹।



চিত্রঃ ২০০৬ সালে লন্ডনের চিড়িয়াখানায় কমোডো ড্রাগন কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা প্রসব করে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দেয়।

বিজ্ঞানীরা ২০০১ সালে নেব্রাস্কার ডুরলি চিরিয়াখানার হাতুরীমুখো হাঙ্গরেরও (Hammerhead shark) প্রজনন লক্ষ্য করেছেন কোন পুরুষসঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই²⁰। এগুলো সবই পার্থেনোজেনেসিস- এর খুবই স্বাভাবিক উদাহরণ। এ ছাড়াও শুধুই মেয়ে প্রজাতির মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিসের উদাহরণ আছে বিভিন্ন মাছে²¹ এবং বহু মেরুদণ্ডী

¹⁹ এনায়েত রহিম, কমোডো ড্রাগনের বিস্ময়কর প্রজনন, নিসর্গ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬; আরো দেখুন, Susan Milius, No-Dad Dragons: Komodos reproduce without males, <http://www.sciencenews.org/articles/20061223/fob1.asp>

²⁰ Captive shark had 'virgin birth', BBC News, May 23, 2007, http://www.nova.edu/ocean/ghri/bbc_virginshark.html

²¹ Vrijenhoek RC, 1984. The evolution of clonal diversity in Poeciliopsis In: Evolutionary genetics of fishes (Turner BJ, ed). New York: Plenum Press; 399-429.

প্রানীতেও²²। পার্থেনোজেনেসিসের আরো ভাল উদাহরণ খুঁজতে চাইলে বাংলাদেশের খোদ ঢাকা শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চলে যেতে পারেন। শুনেছি, আঁশ পোকা নামে এক বদখদ পোকায় নাকি ছেয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার গাছপালা। ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দারা রীতিমত আস্থির। প্রথম আলোতে এ নিয়ে রিপোর্ট পর্যন্ত হয়েছিল। বংশবৃদ্ধির জন্য এ পোকায় কোন পুরুষ লাগে না, মাদী পোকাটি একাই হাজারে হাজার ডিম পেড়ে পঙ্গপালের মত বংশবৃদ্ধি করে আর আশেপাশের গাছপালাগুলোকে ছিবড়া বানিয়ে ফেলে।

²² Vrijenhoek, R. C., R. M. Dawley, C. J. Cole and J. P. Bogart, 1989 A list of known unisexual vertebrates, In Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates, edited by R. Dawley and J. Bogart. Bulletin 466, New York State Museum, Albany, New York, pp. 19-23.